বিবেকমানস

স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা দিতে গিয়ে জোসেফিন ম্যাকলাউড বলেছিলেন, তাঁর বিশালতা বিস্ময়কর! উপরে, নিচে বা পাশে—কোনও দিক থেকেই আমরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারি না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জোড়া বিপুল তাঁর অস্তিত্ব—যা ব্যাপ্ত করে আছে দর্শন আর বিজ্ঞানকে, যা তৃপ্ত করছে সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন, ''তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।'' রোম্যাঁ রোলাঁ 'নর-নারায়ণ' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'MAN-GODS'—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে লক্ষ করে। বিশেষত স্বামীজীকে তিনি 'MAN' আখ্যায় অভিহিত করেছেন। শব্দটিতে সমস্ত অক্ষরই 'ক্যাপিটাল'। রোম্যাঁ রোলাঁ বলতে চেয়েছেন, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, মহত্তম ও শ্লাঘনীয় গুণাবলি সম্ভব, স্বামীজী সেই সবগুলিরই ঘনীভূত মূর্তি। অন্যভাবে বলা যায়, মানবচরিত্রের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল গুণগুলি অনন্তগুণে বর্ধিত করলে যে-মহিমময় অবস্থা কল্পনা করা সম্ভব, সেই অবস্থাই স্বামীজী।

পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ একবার মহাভারতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'নর-নারায়ণ' হলেন দেবতার সেই প্রকাশ, যাঁর মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ করুণা, প্রেম ও আকর্ষণ রয়েছে। এই 'ভারত-অভিমানী দেবতা' বা 'ভারতাত্মা' বিশেষণটি একান্তভাবে স্বামীজীর প্রতিই প্রয়োগ করা যায়।

নিখাদ সোনা দিয়ে গহনার গড়ন হয় না, একটু খাদ তাতে মেশাতেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছিলেন, স্বামীজী এসেছেন 'অখণ্ডের ঘর' থেকে—মানবাত্মার কল্যাণে। কিন্তু সমাধিমগ্ন অখণ্ডের ঋষির মনের সম্পূর্ণ প্রবণতাই সমাধির প্রতি। যখনই তিনি আপন স্বরূপ জানতে পারবেন, তখনই দেহত্যাগ করবেন। বাস্তবিকই আমরা স্বামীজীর জীবনীতে দেখি, তিনি বারবার চেয়েছেন একান্তে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে। স্বামীজীর কাছে মায়া দেশ-কাল-নিমিত্তের পর্দা মাত্র। এই পর্দার মধ্য দিয়ে দেখলে তবেই জগতের অস্তিত্ব। অথচ তিনি স্বস্বরূপে লীন হয়ে থাকলে 'জীবের দুর্গতি নিবারণ' রূপ মহৎকার্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। মায়ার জালে বদ্ধ না হলে তিনি জগৎকল্যাণে কাজ করতে পারবেন না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি পদ্ধতি গ্রহণ

করতে হয়েছিল। একে আমরা বলতে পারি 'Breaking the horse'—ক্রমাগত উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বন্য ঘোড়াকে গৃহপালিত করে তোলা। দুর্দম ঘোড়াকে বশ মানাতে সহিসরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকে। ক্রমাগত মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর মন মায়ার জগতে নামিয়ে আনলেন—সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট যাতে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। নতুবা অখণ্ডের ঘরের ঋষির কাছে জগতের সুখ-দুঃখ বন্ধন-মুক্তি সবই স্বপ্নবৎ। মায়ার জগতে নামলে তবেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁর কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হবে। তখনই তিনি লোককল্যাণের জন্য মায়ের উদ্দেশ্যসাধনের 'যন্ত্র' হয়ে উঠবেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ওই পন্থা গ্রহণ। পিতৃবিয়োগের পর অবর্ণনীয় সাংসারিক কষ্ট দিয়ে এই অধ্যায়ের আরম্ভ। স্বামীজীর সারা জীবনই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। প্রতিটি আঘাতের পশ্চাতেই কোনও দৈব কারণ ছিল নিশ্চিত। যেমন, বোনের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে ভারতীয় নারীর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ব্রাহ্মসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথের কাছে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা ছিল পৌত্তলিকতা। কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেও তিনি কখনই মন্দিরে যেতেন না। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পরই নরেন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়ে সংসারের নির্মম চিত্র। শেষ পর্যন্ত তিনি মা-ভাইদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকেই ধরে বসলেন। ঠাকুরের আদেশে তিনি এক গভীর রাতে গিয়ে দাঁড়ালেন মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমার সামনে। দর্শন করলেন প্রাণ-প্রেম-সৌন্দর্যে ভরপুর চিন্ময়ী মাকে! জাগতিক সমস্ত চিন্তা তাঁর মন থেকে মুহূর্তে হারিয়ে গেল। বারবার প্রণাম করে বলতে লাগলেন, ''মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।'' প্রার্থনা করলেন মায়ের নিত্য অবাধ দর্শন। বারবার তিনবার একই ঘটনা। নরেন্দ্র বুঝতে পারলেন এ শ্রীরামকৃষ্ণেরই লীলা। ঠাকুরও তাঁকে আশ্বাস দিলেন, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব তাঁদের হবে না। সেদিন সারারাত শ্রীরামকৃষ্ণের শেখানো 'মা ত্বং হি তারা' গানটি তিনি গেয়েছিলেন। পরদিন সকালে ঠাকুর সোৎসাহে সকলকে বলছেন, ''নরেন কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে—না?'' এ কি শুধুই নিজের ইষ্টদেবীকে নরেন স্বীকার করে নিয়েছে বলে আনন্দ?—না। নরেন্দ্রনাথের জীবনে মা কালীকে স্বীকারের অর্থ শুধুমাত্র এক দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র নয়। নরেন্দ্রনাথ যে-মুহূর্তে মা কালীকে মেনে নিলেন সেই মুহূর্তে তিনি নাম-রূপকে স্বীকার করলেন অর্থাৎ দেশ (space) ও কাল (time)-কে স্বীকৃতি দিলেন। বলা যেতে পারে তিনি মায়ার জগতে নামলেন।

আগেই বলেছি, অখণ্ডের ঘরের ঋষি যিনি, জগৎ তাঁকে কি বাঁধতে পারে? তাই বারবার তাঁর মন চলে যেত সুদূর হিমালয়ের গুহায়, যেখানে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন—''তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থারও উঁচু অবস্থা আছে।'' তিনি সেদিন আরও বলেছিলেন, ''ছিঃ ছিঃ তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!'' এরপরেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে না জানিয়ে তপস্যার জন্য বুদ্ধগয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

ভারত পরিক্রমার পর কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের শেষ প্রস্তরখণ্ডে বসে ধ্যানে স্বামীজী

উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রয়োজন কী। বুঝলেন তাঁকে সংগ্রাম করতে হবে দুটি বিষয়ের জন্য—মানুষ ও অর্থ। মানুষ তার স্বরূপকে ভুলে গিয়েছে বলেই তার যত দুর্দশা। সে স্বরূপত আত্মা—তাকে স্বমহিমায় স্থাপন করাই তাঁর মূল ব্রত। স্বামীজী সচেতন ছিলেন যে, দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আমেরিকায় যাওয়ার। মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে মহাপ্রাণ মহাপুরুষের এই আত্মত্যাগই অদ্বৈত-বেদান্তের আলোকে মানবতাবাদের জন্মলগ্ন।

ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় শাস্ত্র, গুরু ও মাতৃভূমি—এই তিনটি সুর মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বিবেকানন্দের রচনাবলি তথা দর্শনের মহান সংগীত, যে-সংগীত বুকে নিয়ে স্বামীজী যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন—ভারতবর্ষের যেমন শরীররক্ষার জন্য অন্নের প্রয়োজন, তেমনই পাশ্চাত্যের প্রয়োজন মনের খাদ্য। আরও গভীরভাবে বললে, তাদের প্রয়োজন আত্মার পুষ্টি। তাদের সেই ক্ষুধা মেটাতে দরকার ছিল এক আধ্যাত্মিক শক্তি, যার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর মধ্যে পাশ্চাত্যের মানুষ তা-ই পেয়েছিল। মেরি লুইস বার্ক তাঁর 'Swami Vivekananda in the West : New Discoveries' গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডের প্রস্তাবনায় বলেছেন, শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের পর মনে হয়েছিল যেন অকস্মাৎ মরুভূমির মধ্যে জীবনদায়ী বিশুদ্ধ জলধারা প্রবাহিত হয়েছে।

১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর, 'Sisters and Brothers of America'—বিবেকানন্দ-উচ্চারিত এই পাঁচটি শব্দ কলম্বাস হলের জনসমুদ্রের উপর বোমার আকারে ফেটে পড়েছিল। তবে তা ছিল আধ্যাত্মিক বিস্ফোরণ—যা তাদের প্রত্যেককে তাদের স্বরূপের নিকটবর্তী করেছিল। বিবেকানন্দের শারীরিক সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা সবই ছিল কিন্তু শুধু কি সেগুলিই তাদের আকর্ষণ করেছিল? না, তা ছিল আত্মার আকর্ষণ। পূর্বোক্ত প্রস্তাবনায় শ্রীমতী বার্ক বলেছেন, ''আমরা এ-যাবৎ স্বামী বিবেকানন্দকে একজন অপরিসীম আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে—প্রায় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপেই বর্ণনা করে এসেছি। কিন্তু অশেষ মানবীয় গুণে ভূষিত হয়েও তিনি ছিলেন 'স্বামীজী'। তিনি বহু আমেরিকান পরিবারের কাছে ছিলেন প্রিয় পুত্র ও ভ্রাতা। অপরিসীম দয়ালু স্বামীজী ছিলেন শত শত পাশ্চাত্য অনুগামীর কাছে অতিপ্রিয় শিক্ষক। অগণিত নরনারীর কাছে ছিলেন সহানুভূতিশীল প্রিয়বন্ধু। যেকোনও সময়ের জন্য কোথাও থাকলে তিনি সেই পরিবার বা ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আপন করে নিতেন এবং তাঁরাও তাঁর সঙ্গে আত্মীয়রূপেই বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতেন।... যখন কেউ স্বামীজীর এই ভাবপ্রচারের প্রেরণাকে দৈব ইচ্ছা বলে মনে করেন (এবং মনে না করাটাই কঠিন), তখন দেখতে পান যে ঠিক ঠিক ভাবের উপযুক্ত মানুষ উপযুক্ত স্থানে কালে স্বামীজীর সঙ্গে সহযোগীরূপে মিলিত হয়েছেন। উপরন্তু সেই সহযোগীদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক ছিল খুবই পবিত্র ও মধুর। এই পবিত্র সম্পর্কের জন্য তাঁদেরও খুবই পবিত্র ভাবে উদ্বুদ্ধ ও সমুন্নত বলে মনে হত। সর্বতোভাবে মনে হত, যে-দিব্যহস্ত স্বামীজীর প্রচারকে পরিচালিত করছেন, সেই দিব্যহস্তের স্পর্শেই যেন তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এই দিব্য অনুভব হলেও, তাঁরা আমার-আপনার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁরা সর্বতোভাবেই ছিলেন মানব প্রকৃতির; কিন্তু তাঁদের প্রতি স্বামীজীর এবং স্বামীজীর প্রতি তাঁদের ভালবাসা তাঁকে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। অপরিসীম ভালবাসার যোগ্য এবং অসীম প্রেমময় স্বামীজী শিশুর মতো, শিক্ষাগুরুর মতো এবং ভ্রাতার মতোই

আমাদের মধ্যে বিচরণ করে গেছেন। বলা হয়, এভাবেই ভগবান মানুষের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে লীলা করে থাকেন।" তাঁর সারল্য, স্নিগ্ধতা, সর্বোপরি আত্মার অস্তিত্বে সদা সচেতনতা অন্য সকলকেও সেই একই ধারায় চালিত করেছিল। অদ্বৈতবেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আত্মার ধারণা থেকেই স্বামীজীর মানবতাবাদের জন্ম হয়েছে।

স্বামীজী নারীমুক্তির কথা বলেছেন কিন্তু তা পুরুষশাসিত সমাজের অধীনে একটি পরিকল্পনা মাত্র ছিল না। তাঁর মতে, কোনও পুরুষ নয়— মেয়েরাই মেয়েদের উত্তরণ ঘটাবে। তাঁর কাছে নারী-পুরুষ একই ব্রহ্মসত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তিনি নারীর পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছেন কারণ আত্মা স্বরূপত স্বাধীন। এ-প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য 'শিভালরি'-র নিন্দা করেছেন। সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথাটি খুবই প্রাসঙ্গিক :

''আমরা জানতাম যে-মানুষ যত সভ্যভব্য স্ত্রীজাতিকে তিনি তত বেশি সম্মান করেন। কিন্তু স্বামীজী এমন একজন মানুষ যিনি মেয়েদের প্রতি কোনও নজরই দেন না, এমনকী একজন সাধারণ ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমরা যে সহানুভূতিসূচক ব্যবহার পাই, স্বামীজীর কাছ থেকে সেটুকু আশা করাও বৃথা। যখন আমরা পাথুরে উঁচুনিচু পথ বেয়ে টিলায় উঠতাম বা নামতাম, তিনি ভুলেও আমাদের দিকে তাঁর হাতটি বাড়িয়ে দিতেন না। মুখে কিছু না বললেও আমাদের প্রতি তাঁর এই উদাসীনতায় খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মনের ভাব কি তাঁর অজানা? একদিন তিনি বলে উঠলেন : 'তোমরা বৃদ্ধা, দুর্বল বা অসহায় হলে নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করতুম। কিন্তু তোমরা অন্যের সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে এই ছোট জলধারাটি ডিঙিয়ে যেতে পার বা সামান্য চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে পার। তোমরা আমারই মতো শক্ত-সমর্থ। তোমাদের সাহায্য করতে যাব কোন দুঃখে? মহিলা বলে? ওটা হল শিভালরি (দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সাহায্য-সমবেদনা বা নারীজাতির প্রতি বীরোচিত আনুগত্য)। তোমরা কি বুঝতে পার না, এই অনুকম্পার পেছনে নারী-পুরুষের স্থূল আকর্ষণের খেলাটি রয়ে গেছে?"

যেকোনও ক্ষেত্রে যেকোনও ব্যক্তির পারদর্শিতা প্রদর্শনের ক্ষমতাকেই স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। কারণ সেখানে তিনি অন্তর্নিহিত আত্মার প্রকাশই অনুভব করতেন, যা মানুষকে সর্বক্ষেত্রে বড় করে। মেরি লুইস বার্ক তাঁর একটি প্রবন্ধে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। হিমবাহের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বিমান ভেঙে পড়ে। বহু যাত্রী তখনই মারা যায়। অনেকে বিশাল একটি আইসবার্গের ভিতর আটকে পড়ে। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার এসে তাদের উদ্ধারকাজ শুরু করে। দুজন দুজন করে যাত্রীকে তারা দড়ি ঝুলিয়ে তুলতে থাকে। এক সাহসী যাত্রী শান্তভাবে এক এক করে তাদের বেঁধে দিতে থাকে। সব শেষে যখন হেলিকপ্টার এই মানুষটিকে নিতে ফিরে আসে, ততক্ষণে আইসবার্গটি সম্পূর্ণ গলে গিয়ে তাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শ্রীমতী বার্ক মন্তব্য করেছিলেন, স্বামীজী শরীরে থাকলে এই মানুষটিকে বলতেন, ''This is my man"। হতে পারে সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু যে-শক্তিতে সে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গে ব্রতী হয়েছে, তা আত্মারই শক্তি। এই মহিমাকেই স্বামীজী শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। যেখানেই আত্মার এমন বিকাশ ঘটেছে সেখানেই স্বামীজীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। কোনও পত্রিকায় এক জার্মান যুবকের রচনায় দেখা যায়, তার মতে স্বামীজীর জার্মানিতে আসা উচিত

ছিল, কারণ আর্য সংস্কৃতি, সংস্কৃতভাষা প্রভৃতির প্রসার সেখানেই কিছুটা ঘটেছে। সে মনে করত স্বামীজী তাঁর সুবর্ণসময় নষ্ট করেছেন আমেরিকায় গিয়ে—যেখানে, অপেক্ষাকৃত নতুন দেশ হওয়ায়, ইওরোপীয় দেশগুলির মতো সংস্কৃতির গভীরতা নেই। একবার যুবকটি আমেরিকায় 'নাসা'-র দপ্তরে রকেট উৎক্ষেপণ দেখতে যায়। কাউন্ট ডাউন শুরু হল। দশ থেকে এক গোনার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি—রকেট উঠল আকাশে। যুবকের সারা শরীরে জাগল শিহরণ এবং অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ। সেই মুহূর্তেই সে পিঠে অনুভব করল মৃদু চাপড়; আর স্বামীজী যেন তার কানে ফিসফিস করে বললেন, ''এইজন্যই আমি ইয়াঙ্কিদের ভালবাসি।'' কারণ এই অ্যাডভেঞ্চার-প্রবণতাই মনুষ্যত্বের তথা আত্মার মহিমাপ্রকাশ।

মানুষের যথার্থ সত্তায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ কখনও কাউকে ছোট করতে পারতেন না। আমেরিকান চোখ তাঁকে কালো বলে ভুল করত এবং নিগ্রো মনে করে প্রায়ই হোটেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দোকানের দরজা তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিত। স্বামীজী কখনও এর প্রতিবাদ করেননি, জানাননি যে তিনি প্রাচ্যের মানুষ—নিগ্রো নন। এমনও হত, তাঁকে বিতাড়িত করবার পরদিনই হয়ত হোটেল-মালিক তাঁর বক্তৃতা পড়ে ও সর্বত্র তাঁর নাম উচ্চারিত হতে শুনে ক্ষমা চাইতে ছুটে গেছে। একবার এক নিগ্রো খুব আনন্দের সঙ্গে স্বামীজীকে বলে : তার এই জাতভাইটি (স্বামীজী) এত প্রতিপত্তিশালী হয়েছেন বলে সে গর্বিত, সে তাঁর সঙ্গে একবার করমর্দন করতে চায়। শুনে স্বামীজীও খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে তাকে বলেছিলেন, ''ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ।'' পরে এক অনুরাগী স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনি বলেন না কেন যে আপনি নিগ্রো নন?'' স্বামীজী উত্তর দেন : ''কী? অন্যকে ছোট করে আমি বড় হব? আমি তো সেজন্য জন্মাইনি!''

পঞ্চমত, মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন বিবেকানন্দের মানবাত্মার প্রতি ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। তাই কখনই তিনি নিজের চিন্তা দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করতে চাইতেন না। স্বামী নিখিলানন্দ রচিত স্বামীজীর জীবনীতে আমরা দেখি, নিউ ইয়র্কে একদিন বক্তৃতার সময় স্বামীজী হঠাৎ চুপ করে যান এবং সভা ভঙ্গ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। শ্রোতৃবর্গ খুব হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। এক সঙ্গী ফেরার পথে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন এভাবে বক্তৃতা বন্ধ করার কারণ কী, বিশেষত যখন বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ উভয়ই উত্তেজনার তুঙ্গে ছিলেন! স্বামীজী কি পয়েন্ট ভুলে গেলেন, অথবা নার্ভাস হয়ে পড়লেন? স্বামীজী উত্তর দেন, বক্তৃতা চলাকালীন তিনি নিজের মধ্যে প্রচুর শক্তি অনুভব করেন, দেখেন শ্রোতারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে তাঁর ভাবে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন—নরম মাটির মতো হয়ে পড়েছেন, ইচ্ছে করলেই তাঁদের মনকে খুশিমতো আকার দেওয়া যায়। এটা স্বামীজীর ভাবাদর্শের বিপরীত। তিনি চান প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী গড়ে উঠবে। তাই তিনি থেমে গিয়েছিলেন। সেই কারণে বক্তৃতা করতে করতে অনেক সময়ই তিনি থেমে যেতেন। যখনই দেখতেন তাঁর কথার শক্তি শ্রোতাদের মনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলেছে, মনগুলি সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, তখনই তিনি থেমে যেতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকে নিজের মতো করেই বিকশিত হোক—তাঁর মতো করে নয়। স্বামীজী ছিলেন গুরুর যথার্থ শিষ্য। আমাদের মনে পড়বে, শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারিভেদে সকলের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি চাইতেন, যে-কারণে তিনি অভেদানন্দজীর মধ্যে স্বামীজীর শক্তিসঞ্চারের ঘটনা সমর্থন করেননি।

স্বামীজী সকলের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে দেখতে

পেতেন বলে বাহ্য অপূর্ণতা তাঁর চোখে পড়ত না, সকলের প্রতি তাঁর ভালবাসা শতধারে উৎসারিত হত। এই কারণেই তাঁকে তাঁর পরিচিত জনেরা 'মূর্তিমান প্রেম' বলে অনুভব করতেন। বিশেষত শিশুদের যে তিনি কত ভালবাসতেন তার প্রমাণ বারবারই পাওয়া যায়। মিসেস হ্যান্সব্রোর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তাঁদের বাড়িতে থাকাকালীন কখনও কখনও স্বামীজী সামনের মাঠে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতেন। মিসেস হ্যান্সব্রোর শিশুকন্যা ডরোথির অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল—তারা সবাই এসে জড়ো হত এবং স্বামীজী তাদের হাত ধরে 'রিঙ্গা রিঙ্গা' ঘোরার খেলা বা অন্য নানান খেলা খেলতেন। ছোট ছোট সঙ্গীদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম আনন্দ তিনি উপভোগ করতেন না। আবার তিনি শিশুদের চালচলনও লক্ষ করে আনন্দ পেতেন, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করতেন, প্রশ্ন করে জেনে নিতেন : কেন তারা এ-খেলাটা বা ও-খেলাটা ভালবাসে ইত্যাদি। স্বামীজী শিশুদের প্রশিক্ষণের সমস্যা নিয়েও অনেক সময় বড়দের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি শাস্তি দেওয়া পছন্দ করতেন না, বলতেন, ''আমি কখনও এমন ব্যবহার করব না, যাতে শিশুরা ভয় পায়।'' কখনও কখনও স্বামীজী বাগানে শিশুদের সঙ্গে বসে তাদের ছবির বইগুলি দেখতেন। 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' এবং 'এলিস থ্রু দি লুকিং গ্লাস'—বই দুটি পড়ে বেশ মজা পেতেন তিনি। বলতেন, এ-দুটিতে মানবমনের ক্রিয়াকলাপের চিত্রটি যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লুইস ক্যারল-এর অতি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই তিনি এ-বই দুখানি লিখতে পেরেছেন—এই ছিল স্বামীজীর মত।

এই মানুষটিই আবার হুটোপাটিতে অদ্বিতীয়। লন্ডনে মি. স্টার্ডির বাড়িতে থাকার সময়কার একটি ঘটনা। সেদিন গম্ভীরপ্রকৃতির স্টার্ডি উপস্থিত ছিলেন না। স্বামীজী এবং স্বামী সারদানন্দজী দুজনেই বাড়ির সামনে সাইকেল চালাতে চেষ্টা করছিলেন, যদিও বিশেষ কৃতকার্য হচ্ছিলেন না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, স্বামীজী সেদিন বালকসুলভ হাসিঠাট্টার মেজাজেই ছিলেন এবং খুবই মধুর স্বরে একটি গান গেয়েছিলেন : ''সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে'' ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত বেলুনে চড়ার ঘটনাটিও উল্লেখ করা যায়। সেটা ১৮৯৬ সাল। জেনেভাতে সুইজারল্যান্ডে উৎপন্ন হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনী চলছিল। সেই মেলায় এক বিরাট বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে, নিচে আরোহীদের বসার জন্য একটি ঝুড়ির মতো আসন জুড়ে দিয়ে এবং খুঁটিতে বাঁধা যথেষ্ট লম্বা একগাছি দড়ির সঙ্গে ওই বেলুনের সংযোগ রেখে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বেলুনটি ওড়ানো হচ্ছিল। বেলুনটি স্বামীজীর মন কেড়ে নিল। সূর্যাস্তের শান্ত মুহূর্তে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা সেই বেলুনের ঝুড়িতে গিয়ে উঠলেন। মিসেস সেভিয়ার ভীত—তবু স্বামীজীর অতি উৎসাহের কাছে তাঁর অনিচ্ছা টিকল না। বেলুনটি উঁচু থেকে আরও উঁচুতে আকাশে উড়ে যেতে থাকল—যেন একটি বড় পাখি স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়ছে। দিনটি ছিল খুবই চমৎকার, সূর্যাস্তও ছিল

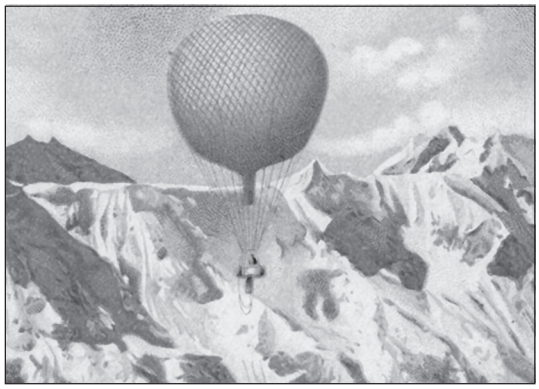

জেনেভা প্রদর্শনীর বেলুনের আদলে অঙ্কিত চিত্র

রাজকীয়, আর বেলুনটি সান্ধ্যবাতাসে ধীর গতিতে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হচ্ছিল। খুব অল্প সময়ের জন্যই বেলুনটি উড়ল। কিন্তু স্বামীজী এত মজা পেয়েছিলেন যে তিনি রাত হওয়ার আগে আর একবার বেলুনে চড়ার বায়না ধরলেন। সবাই ক্ষুধার্ত এবং আরও অনেক কিছু দেখা বাকি বলে দ্বিতীয়বার বেলুন চড়ায় বাধা পড়ল।

স্বামীজীর উপলব্ধি ছিল, শিক্ষা ও তজ্জনিত আত্মবিশ্বাস মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষে তার নিতান্ত অভাব দেখে তিনি সরলা ঘোষালকে লিখেছিলেন, ''ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সংকুচিত হচ্ছেন। নিউ ইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman কে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।''

স্বামীজীর সিঞ্চিত শক্তির বীজ যেখানে পড়বে সেখানেই জন্ম নেবে 'Super human being'। মেরি লুইস বার্ক বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে স্বামীজী ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গেলেও, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। ''তিনি আমেরিকার গভীর অন্তরস্থ চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।... তাঁর শক্তির ধরন ছিল অতি সূক্ষ্ম, যেখানে মানুষের চিন্তার উদ্ভব হয়, সেই চৈতন্যভূমির ওপর বিচরণশীল ছিল তাঁর শক্তি।''

এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই স্বামীজী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে লেখেন, ''একজন মাদ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর—তোলপাড় কর দুনিয়া। কি বলব আপসোস—যদি আমার মতো দুটো-তিনটে তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।... একটাকে চীনদেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা।'' আবার বলেছেন, ''আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলে উঠুক।'' সে-আগুন দহন করে না—তার তেজ আছে, তীব্রতা নেই। সে-আলোর উজ্জ্বলতা আছে, উত্তাপ নেই। বিশাল উদার আকাশের মতো তার ব্যাপ্তি।

একদিন না একদিন বিবেকানন্দের মানবতাবাদের স্ফুরণ ঘটবে সর্বত্র। বীজাকারে-থাকা তাঁর শক্তি অঙ্কুরিত হবেই হবে—এই বিশ্বাস কার্যকরী হোক, এই প্রার্থনা স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে।